Regional Register

সুলতানার স্বপ্ন

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

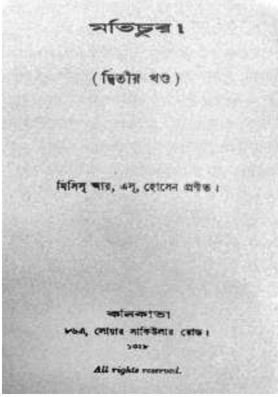

মতিচুর।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মিসিস্ আর, এস্, হোসেন প্রণীত।

কলিকাতা
৮৬এ, লোয়ার সার্কিউলার রোড।
১৩২৮

All rights reserved.

প্রথম প্রকাশ: মতিচুর-দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২২

ভূমিকা

ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড এশিয়া-প্যাসিফিক কমিটি মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটারে ৬-১০ মে, ২০২৪ অনুষ্ঠিত দশম বার্ষিক সভায় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের *সুলতানাজ ড্রিম*-কে বিশ্বস্মৃতির আঞ্চলিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রোকেয়ার প্রামাণ্য রচনা ও দলিলাদির সংরক্ষক হিসেবে বিধিবদ্ধভাবে এই প্রস্তাবনা পেশ করেছিল এবং এর স্বীকৃতি আমাদের সবার জন্য হয়েছে আনন্দবহ।

নারী-পুরুষের সম-অধিকার সম্পন্ন সমাজ এবং মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যবহার ও পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাত্রার যে-ভবিষ্যতের স্বপ্ন রোকেয়ার রচনায় ফুটে উঠেছে, এর বিশ্বজনীন তাৎপর্য ও স্বীকৃতি ইউনেস্কোর ঘোষণায় প্রকাশ পেয়েছে। *সুলতানাজ ড্রিম* লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে এবং ১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় চেন্নাই, ভারতের *ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে*। ১৯০৮ সালে কলকাতার এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং পুস্তিকা হিসেবে এটি প্রকাশ করে। ১৯২২ সালে 'মতিচুর'-দ্বিতীয় খণ্ডে রোকেয়া এর বাংলা ভাষ্য যুক্ত করেন।

মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড এশিয়া প্যাসিফিক কমিটির রিভিউ সাব-কমিটি প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করে তাদের সুপারিশ সাধারণ সভায় পেশ করে। কমিটি রোকেয়ার *সুলতানাজ ড্রিম* সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে যে, "রোকেয়ার স্বপ্নপুরী নারীদের নিজেকে ও বিশ্বকে অবলোকনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ও আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি যোগায় এবং তাদের দিগন্তে প্রসারতা আনে। *সুলতানাজ ড্রিম* ও রোকেয়া উপমহাদেশে ও তা' ছাপিয়ে নারীমুক্তির সমার্থক হয়ে উঠেছে, যা সাম্প্রতিক প্রকাশনা ও শিল্পরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রস্তাবিত দলিলপত্র রোকেয়ার জীবন এবং সমাজে শিক্ষা বিশেষভাবে নারী শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস।" রিভিউ সাব-কমিটি এটাও উল্লেখ করে, "এই কাজের পরবর্তী সংস্করণ, অনুবাদ

ও মুদ্রিত ভাষ্যরূপ ছাড়াও অন্যান্য উপস্থাপন এবং রোকেয়ার অবদানের স্বীকৃতি আজকের বাংলাদেশে বিশেষ বলবান হয়ে উঠেছে।”

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি তাই রোকেয়ার অবদান, যা বিশেষভাবে মূর্ত হয়েছে *সুলতানাজ ড্রিম* রচনায়, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব মেলে ধরে। সেই লক্ষ্য থেকে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড হিসেবে *সুলতানাজ ড্রিম*-এর বর্তমান প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হলো। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থের প্রতিলিপি অনুসরণে নিবেদিত বর্তমান মুদ্রণে বাংলা ভাষ্যও যুক্ত হয়েছে। বাংলা রূপান্তর রোকেয়া নিজে করেছিলেন এবং তা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে, *মতিচুর* দ্বিতীয় খণ্ডে। বাংলা ভাষ্যে রোকেয়া অনেক স্বাধীনতা নিয়েছেন, মাঝে-মধ্যে নতুন বাক্য যুক্ত ও পাদটীকা প্রদান করেছেন। সেই বিবেচনায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষ্য মিলিয়ে পাঠ নেয়ারও গুরুত্ব রয়েছে।

রোকেয়ার কাজের বৈশ্বিক স্বীকৃতি আমাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আরও সচেতন করে এবং নতুন প্রেরণা যোগায়। আমরা আশা করবো রোকেয়া ও তাঁর *সুলতানাজ ড্রিম*-এর স্বপ্নযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং সকলের, বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের নারী ও পুরুষের সম্মিলিত সাধনায় বাধা-বৈষম্য মোকাবেলা করে স্বপ্নপূরণের পথে বিশ্ব এগিয়ে যাবে।

মফিদুল হক
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
এবং প্রস্তাবক, ইউনেস্কো মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড কর্মসূচি

(বর্তমান লেখিকার Sultana’s Dream গত ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে Indian Ladies’ Magazine-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।)

সুলতানার স্বপ্ন

একদা আমার শয়নকক্ষে আরামকেদারায় বসিয়া ভারত-ললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম– আমাদের দ্বারা কি দেশের কোনো ভালো কাজ হইতে পারে না?–এইসব ভাবিতেছিলাম। সে-সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটি লক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক-একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালি-সৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণকান্তি, কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা– ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম, যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না–কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয় রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কী প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা ‘ভগিনী সারা’ (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা ‘সুপ্রভাত’ বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন! আমি মনে মনে হাসিলাম–এমন শুভ্র জোছনাপ্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, ‘সুপ্রভাত।’ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি

কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম–

‘আপনি কেমন আছেন?’

‘আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?’

আমি মুক্তবাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমাচন্দ্রের প্রতি চাহিলাম–ভাবিলাম, এ সময় যাইতে আপত্তি কী? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দার্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে–ফুলের লিঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি, সে-সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবত আমাকে তদ্রূপ কোনো উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্তে আসিয়াছেন; আমি বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কী–এ তো সে জোছনাময়ী রজনী নহে!–এ যে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কী বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম–যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম–

‘উহারা কি বলিতেছে?’

উত্তর পাইলাম,–‘উহারা বলে যে, আপনি অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন।’

‘পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কী?’

‘ইহার অর্থ এই যে, আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!’

‘পুরুষের মত লজ্জানম্র!’ এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস তো কখনও শুনি নাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন–ইঁহাকে কখনও দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা–একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কিনা, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন–

‘আপনার কী হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!’

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্তত করিয়া বলিলাম, ‘আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; আমরা পর্দানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।’

‘আপনার ভয় নাই–এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম ‘নারীস্থান’[১] এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।’

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলি দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্বে আর কখনো এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণকালে আমার

---

১. ‘পরীস্থান’ শব্দের অনুকরণে ‘নারীস্থান’ বলা হইল। ইংরাজীতে ‘লেডীল্যান্ড’ বলা গিয়াছে।

বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মসনদের উপর বেড়াইতেছি–ভূমির দিকে দৃকপাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, ‘আহা! কি সুন্দর!’

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি এসব পছন্দ করেন কি?’ (আমি তাঁহাকে ‘ভগিনী সারা’ই বলিতে থাকিলাম এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

‘হ্যাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।’

‘সেজন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ-ফুলের কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ এক জাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।’

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক্‌পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য–আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, ‘সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জভবনের মত দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতি-রাণীর লীলাকানন! আপনাদের উদ্যানরচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।’

‘ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন।’

‘তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল পুষ্পবনের উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।’

‘ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কী বলিতে পারেন? জানেন তো অলসেরা অতিশয় বাক্‌পটু হয়!’

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল, সে দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ

বলিতে একটি বালক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘পুরুষেরা কোথায়?’

উত্তর পাইলাম, ‘যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।’

ভাবিলাম, তাহাদের ‘উপযুক্ত স্থান’ আবার কোথায়–আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, ‘মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালোমতো বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের ‘উপযুক্ত স্থানের’ অর্থ কী?’

‘ওহো! আমার কী ভ্রম! –আপনি আমাদের নিয়ম আচার জ্ঞাত নহেন, এ-কথা আমার মনেই ছিল না। এদেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।’

‘কী! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেইরূপ তাঁহারাও থাকেন নাকি?’

‘হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।’

‘বাহ্ ! কী আশ্চর্য ব্যাপার।’ বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন। আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;–পৃথিবীতে অন্তত এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, ‘ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত, স্বাধীনতা ভোগ করে। কী বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?’

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ-প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম–‘অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবত দুর্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।’

‘হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন, –যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে।

তা কোনো বন্য জন্তু কোনো একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও তো সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?'

'তাহা ঠিক; হিংস্র জন্তুটা ধরা না– পড়া পর্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।'

'মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি–এমনকি ভালো মানুষের প্রতিও নানাপ্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কী করিবে?'

'তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।'

'বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধহয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, না?'

'অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দী করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?'

'কিন্তু কার্যত আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা, যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামি করে, বা অন্তত করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?'

'জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোনো হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু–তাহারা সমুদয় সুখসুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়–তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কতশত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।'

‘তাই তো! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—‘দোষ কার, বন্দী হয় কে!’ কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?’

‘না পরিয়া করি কী? ‘জোর যার মুলুক তার’; যাহার বল বেশি, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য।’

‘কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলেবিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।’

‘শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কী করিবে?’

‘তাহারা কিছুই করিবে না—তাহারা কোনো ভালো কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন।’

‘কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য যথা রাজকার্য, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!’

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না, সম্ভবত আমার ন্যায় অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন।

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়িখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কী চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের

বাসভবন। বাড়ি বলিতে, একটি টিনের বাঙ্গালা মাত্র; কিন্তু সৌন্দর্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত। সাজসজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল; তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে–তাহা কেবল দেখিবার জিনিস।

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। একটি খঞ্চিপোষে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন আমিও সেলাই জানি কি না। আমি বলিলাম–

‘আমরা অন্তপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।’

‘কিন্তু এদেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া নিশ্চিন্ত রহিতে পারি না।’ এই বলিয়া তিনি হাসিলেন, ‘পুরুষদের এতখানি সহিষ্ণুতা কই যে তাহারা ধৈর্যের সহিত ছুঁচে সূতা পরাইবে?’

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, ‘তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?’ তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানাপ্রকার সলমা চুমকির কারুকার্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, ‘হাঁ, এ-সব আমারই স্বহস্ত প্রস্তুত।’

‘আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে তো অফিসের কাজও করিতে হয়, না? কি বলেন?’

‘হাঁ। তা আমি সমস্তদিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি।’

‘দুই ঘণ্টায়! আপনি এ কী বলেন?–দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ–যেমন মাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রমুখ প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।’

‘আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন যে, তাহারা সাত-আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?’

‘নিশ্চয়, বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।’

‘না প্রিয় সুলতানা। ইহা আপনার ভ্রম। তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ আবার অফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই-তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্যত তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন, তাহা এই যে, কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ। মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।’

তাই তো। অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না। ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাঁহাদের নারীস্থান কখনো মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না। বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম–নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন! তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবেমাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্তমানে) নির্বাপিত হইবে। যে নব কিশলয় সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ঝরিবে!

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল, তিনি বলিলেন, ‘প্লেগ-টেলেগ কিছুই নহে–কেবল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশি–নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশি হয় এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী

অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ দেশে অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক তো দেখি!'

তাই তো, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিংবা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন, প্লীহা-স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পরদা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধনগৃহ, না নন্দনকানন! রন্ধনশালার চতুর্দিকে সবজিবাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারির লতাগুল্মে পরিপূর্ণ; ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোনো চিহ্ন নাই—মেজেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তর নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

'আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও তো অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?'

তিনি বলিলেন, 'সূর্যোত্তাপে রান্না হয়।' অতঃপর কীপ্রকারে সৌরকর একটি নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি তৎক্ষণাৎ একপাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধনপ্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কী প্রকারে?'

ভগিনী বলিলেন, 'কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারাণী সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা

ছিলেন। তিনি নামতঃ রাণী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য-শাসন করিতেন।’

‘মহারাণী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানচর্চা করিতে ভালোবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল যে, তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হউক। মহারাণীর খেয়াল–সে খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল! অচিরে গভর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা স্কুল স্থাপিত হইল। এমনকি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয় স্রোত-প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোনো কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না–এই আইন হইল। আর এক কথা–এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মতো কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।’

‘এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!’ এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

‘কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান সেই প্রকারই আছে! কতদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।’

‘আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারাণী–আর কি কোনো অভাব থাকিতে পারে? অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা প্রিন্সিপ্যাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন, এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করা গেল–বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল–এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত

করিলেন। বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জলগ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডি প্রিন্সিপ্যাল প্রাকৃতিক ঝড়বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।'

'বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দম দেখিলাম না।' কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না–নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব। তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি–তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোনো পুরুষে পরিচয় নাই। সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোনোমতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন :

'দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল–অতিহিংসায়[২] তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। প্রিন্সিপ্যাল মনস্থ করিলেন যে, এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামতো যথাতথা বিতরণ করিতে পারেন।

'যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায়

---

[২] হিংসা বৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষণীয়? কিন্তু হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই ত মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেদে ইর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে কোন মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে পাইলেন যে জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জল গ্রহণ করিতে এবং সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমনকি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে ‘স্বপ্নকল্পনা’ বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।’

আমি বলিলাম, ‘আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কী প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোনোরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন নাকি?’

ভগিনী বলিলেন, ‘না।’

‘তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও তো সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনোরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।’

‘হাঁ, তাই বটে!’

‘কে প্রথমে পুরুষ-প্রবরদের পরাভূত করিল—সম্ভবত কতিপয় নারীযোদ্ধা?’

‘না, এদেশের পুরুষদের বাহুবলে পরাস্ত করা হয় নাই।’

‘হাঁ, ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে, তবে?’

‘মস্তিষ্ক-বলে।’

‘তাহাদের মস্তিষ্কও তো রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?—কী বলেন?’

‘মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও তো মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু তো মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে।’

‘ঠিক তো। কিন্তু কী প্রকারে কর্তারা বন্দী হইলেন, এ-কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন, আর বিলম্ব সহে না।’

‘স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনাচিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে ‘স্বপ্নকল্পনা’ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যালদ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।’

‘ভারি আশ্চর্য!’ আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, ‘এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া ‘স্বপ্নকল্পনায়’ বিভোর রহিয়াছেন।’

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

‘কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোনোপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি কেবল স্বামীত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারাণীকে ঐ আসামি ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাণী তো দয়াপ্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

‘আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল

সংগ্রাম বাঁধিল, রক্তগঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লানবদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

‘কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈ শনৈ পশ্চাদবর্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশ অগ্রসর হইল।

‘কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর-ভদ্র সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমনকি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল। অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর দুই-চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবেন।

‘এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জন-কতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কী করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

‘কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমতো যুদ্ধ করিতে যাইবেন, অন্যদল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব—কারণ একে তো অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন যে, যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক—রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।’

মহারাণী বলিলেন, ‘যদি আপনারা বাহুবলে দেশরক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্কবলে দেশরক্ষার চেষ্টা করুন।’

সকলে নিরুত্তর, সভাস্থল নীরব। মহারাণী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, ‘যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।’

‘এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণে নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন–এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশাভরসা তো নাই–শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন–যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে তো সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই–তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রুজয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা–যদি এই উপায়ে কৃতকার্য হওয়া না যায়, তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মহারাণীর সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা ধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, ‘আত্মহত্যা করিব!’ সে যেন ততোধিক তোজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, ‘বিদেশীয় অধীনতা স্বীকার করিব না।’

‘সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং লেডি প্রিন্সিপ্যালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

লেডি প্রিন্সিপ্যাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, ‘আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পরদার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।’ মহারাণী উত্তর করিলেন, ‘অবশ্য! তাহা তো হইবেই।’

‘পর দিন মহারাণীর আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা হইল যে, অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সেজন্য সমস্ত নগরে পর্দা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

‘অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরে ভাবিলেন, মন্দ কী? তাঁহারা আহত

এবং অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত ছিলেন–যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারাণীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত শুভ আশীর্বাদ মনে করিলেন। মহারাণীকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনাবাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, দেশরক্ষার কোনো আশা নাই–মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাহাদের এই অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কী? শেষটা কী হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।'

'অতঃপর লেডি প্রিন্সিপ্যাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমরপ্রাঙ্গণে যাত্রা করিলেন–'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'দেশের পুরুষদিগকে তো পরদার অনুরোধে জেলখানায় বন্দী করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পরদার আয়োজন করিলেন কিভাবে, উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন নাকি?'

'না ভাই! বন্দুক-গুলি তো নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না–অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পরদার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না–যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল, বিশেষত তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।'

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম,'হয়তো রণভূমে মূর্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভাদর্শনে তাহাদেরই নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল–'

'তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়–স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে।'

'বটে? কী প্রকারে? আর আপনারা বিনাঅস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?'

'যোদ্ধার সঙ্গে সেই সূর্যোত্তাপ-সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনো স্টিমারের সার্চলাইট (search light) দেখিয়াছেন কি?'

দেখিয়াছি।'

'তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বি-সহস্র সার্চলাইট ছিল–অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মতো নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। স্টিমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রখরতা থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল; ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপরশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন–তখন তাহারা হয়তো ভাবিয়াছিল, একি ব্যাপার! শত-সহস্র সূর্য মর্ত্যে অবতীর্ণ। সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই–একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই–অথচ শত্রু পরাজিত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।'

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, 'যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া আপনাদের কোনো অনিষ্ট হইত!'

'আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল। তদবধি আর কোন প্রতিবেশী রাজা-মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।'

'তারপর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি?'

'হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে মহারাণী সমীপে আবেদন

করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে অকৃতকার্য হওয়ার দোষে সমর বিভাগের রাজকর্মচারীগণই দোষী, সেজন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা তো কদাচ কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুর কারাগারে বন্দী থাকিবেন কেন? তাঁহাদের পুনরায় স্ব-স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।'

'মহারাণী তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি আবার কখনো রাজকার্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

'আমরা এই প্রথাকে 'জেনানা' না বলিয়া 'মর্দানা' বলি।'

আমি বলিলাম, 'বেশ তো। কিন্তু এক-কথা–পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি তো 'মর্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার অনাচারের বিচার করে কে?'

'যদবধি 'মর্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এদেশে কোনোপ্রকার পাপ কিংবা অপরাধ হয় নাই, সেইজন্য আসামি গ্রেফতারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না–ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।'

'তাই তো আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই[৩] শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানি[৪] থাকিবে কিরূপে। যদি কোনো স্ত্রীলোক কখনো কোনো বেআইনি কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাহারা বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয় করিতে পারেন–অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে?'

৩.পুরুষ জাতিকে।

৪. পাপ।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘প্রিয় সুলতানা! আপনি এখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন?’

আমি সহাস্যে বলিলাম, ‘আপনার রান্নাঘরটি রাণীর বসিবার ঘর অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু কর্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয়তো তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন।’

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্তত উদ্যানের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম–‘আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারি আশ্চর্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব–নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন, এক-কথায় যাবতীয় গৃহকার্য করেন। আর রন্ধনপ্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার, যে, রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার। ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড় ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে আর রন্ধনকার্যে আপত্তি করিতেন না।’

‘ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। বিশেষ একখণ্ড কাচ (convex glass) দ্বারা যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাচবিশিষ্ট যন্ত্র নির্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।’

‘জানেন ভগিনী সারা। ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না–জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়, সিদ্ধি করতালি লাভে। কোনো দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই–কিংবা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই।’

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না।'

'তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন আর প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশকে স্বর্গতুল্য পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটা সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা–বরং ক্রমশ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি।'

'পুরুষের কার্যে আর রমণীর কার্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম পুরুষেরা কোনো ভালো কাজ সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধ হয় এতক্ষণে সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন।'

'হাঁ, এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম। আচ্ছা ভগিনী সারা, আপনারা ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য করেন কিরূপে?'

'আমরা বিদ্যুৎ-সাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়–ভারী বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ুশকটও তদ্দ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধ সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।'

'সেইজন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই–রাজপথেও লোকে শকটচক্রে পেষিত হয় না। যে-সব পথ আছে, তাহা তো কুসুমশয্যা বিশেষ। বলি, আপনারা কখনো কখনো অনাবৃষ্টিজনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?'

'দশ-এগার বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাহাতে নল দেখিতে পাইতেছেন–উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যক মতো সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। আবার

জলপ্লাবনেও আমরা ঈশ্বর কৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।'

'তবে তো এদেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর ন্যায় ঝগড়াকলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে সর্বস্বান্ত হয় কি?'

'না ভগিনী। আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানাপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের গুণবতী মহারাণীর সাধ—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন।'

'রানীর এ-আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার। আপনাদের প্রধান খাদ্য কী?'

'ফল।'

'ভালো কথা, আপনারাই তো সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কী করেন?'

'বড় বড় কল-কারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন, খাতাপত্র রাখেন—এক-কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে-কার্যে কায়িকবলের প্রয়োজন সেইসব কার্য করেন।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'ওহ্। তাঁহারা কেরানি মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন।'

'কিন্তু কেরানি ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি—তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্কচালনা করি। আমরা যে-সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ—পুরুষ শরীর, রমণী মন।'

'তা বেশ। কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা এ-কথা শুনিলে খড়্গহস্ত হইবেন। তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র–'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই। আমরা তাঁহাদের 'ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙাকুলা' মাত্র। আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়িঘর ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা তো বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয় ধারা মনে করি।'

'আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসী চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না, এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা–সে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সূর্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।'

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ-কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মতো। ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামতো বৃষ্টিজলে স্নান করা যায়। প্রত্যেকের গৃহপ্রাঙ্গণে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে–আদি বেলুনের সহিত ঐ জলাধারগুলির যোগ আছে। আমি মুগ্ধভাবে বলিলাম, 'আপনারা ধন্য। স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী, আর কী চাই! পার্থিব সম্পদে তো আপনারা অতিশয় ধনী, আপনাদের ধর্মবিধান কিরূপ–জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

'আমাদের ধর্ম–প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিতে ধর্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্যত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালেভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে ....'

'তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?'

'না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীব হত্যায়, বিশেষত মানব হত্যায় আমোদ-বোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কী অধিকার? অপরাধীকে নির্বাসিত করা হয়, এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।'

'কোনো মিথ্যাবাদীকে কখনো ক্ষমা করা হয় না কি?'

'যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।'

'এ-নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্মই রাজত্ব করিতেছে। ভালো, একবার মহারাণীকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণাপ্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য হয়।'

'বেশ চলুন।' এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। একখণ্ড তক্তায় দুখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল। পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন। গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্‌চকে ছিল, কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রোপ্য-নির্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি জীবনে কোনোদিন ওজন হই নাই, কাজেই নিজের গুরুত্ব আমার জানা ছিল না, ভগিনী বলিলেন, 'আসুন তবে আপনাকে ওজন করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।'

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার! যাহা হউক ওজনে আমি একমণ ষোল সের হইলাম। শুনিলাম, তিনি আটত্রিশ সের মাত্র। তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা আর কোনো গুণে না হউক আমি গুরুত্বে বেশি তো!

তারপর দেখিলাম, ঐ চক্‌চকে গোলার ছোটবড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে-গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে আমরা শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোটবড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এইজন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর এইরূপ বায়ুযানে দুইটি পাখার মতো ফলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখ্‌তে

রওয়াঁ'খানি[৫] ধীরে ধীরে ৭/৮ হাত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তারপর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানেবিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন–এবং সেইসঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না–সবে তখ্‌তে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি আমরা চপলাগতিতে রাজধানীতে উপনীত। সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী-সহচরী পরিবেষ্টিতা মহারাণী তাঁহার চারি বৎসর বয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ। তাহার সৌন্দর্যের তুলনা এ-জগতে নাই।

মহারাণী দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, 'বা! আপনি এখানে!' ভগিনী সারা রাণীকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারাণীর সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কি যেন মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই; 'কিন্তু যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে,– দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে

---

[৫] ইংরাজীতে Travelling Throne বলা যাইতে পারে।

না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোনো প্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমি-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা এক খণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না,–যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর-সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।'

মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু যেই আমাদের তখ্‌তে রওয়াঁখানি ঈষৎ হেলিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, আমি কি জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম,– সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনও সেই আরাম কেদারায় উপবিষ্টা!